বেঙ্গল টাইমস

১৫ আগস্ট, ২০২২

ISSN 2445-5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস মানে কী? খুব ছোটবেলায় মনে হত, নিছক একটি ছুটির দিন। সেইদিন পড়াশোনা নেই। বাড়ির বকাঝকা নেই। যা খুশি করা যায়। এখনও কি সেই ধারণা খুব বেশি বদলেছে? শনি, রবি ছুটির দিনের পর যদি সোমবার পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই। দিঘা বা দার্জিলিংয়ের সেই উপচে পড়া ভিড়। এবার স্বাধীনতা দিবস সেই সোমবারেই পড়েছে। লম্বা ছুটির আবহ তৈরি। শুধু কাতারে কাতারে দিঘায় জমায়েতের অপেক্ষা।

স্বাধীনতা মানে একঝাঁক গুরুগম্ভীর বিতর্কও হাজির হয়ে যায়। অহিংস পথে নাকি জঙ্গি আন্দোলনে, কোন পথে এসেছে এই স্বাধীনতা? কার কতটা অবদান? একজনকে মহান দেখাতে গিয়ে আরেকজনকে অহেতুক ছোট দেখানোর ট্র্যাডিশনটাও বেশ পুরনো। ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়–এই জাতীয় কথা এখন আর শোনা যায় না ঠিকই, তবে আক্ষেপ করে কেউ কেউ বলেন, এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলাম? আবার কেউ কেউ ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে।

বেঙ্গল টাইমসের এই সংখ্যায় গুরুগম্ভীর পর্যালোচনা নয়। বরং, দু–একটা অন্যরকম বিষয়ে আলো ফেলার চেষ্টা। স্বাধীনতার সেই পুণ্যলগ্নে কোথায় ছিলেন গান্ধীজি? ১৫ আগস্ট দিনটিতে স্বাধীনতার আড়ালে আরও কোন কোন ঘটনা চাপা পড়ে থাকে? বাংলাদেশের কাছে দিনটা কেনই বা কান্নার স্মৃতি বয়ে আনে? স্বাধীনতা দিবসের অনিবার্য গান কীভাবে তৈরি হয়েছিল? এমনই টুকরো টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু বিষয়। সঙ্গে অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

শারদোৎসব দরজায় কড়া নাড়ছে। চলছে পুজো সংখ্যার প্রস্তুতিও। পাঠকের জন্যও অবারিত দ্বার। আপনিও পাঠিয়ে দিন আপনার পছন্দের লেখা।

স্বাধীনতার আড়ালে অন্য এক ১৫ আগস্ট

স্বাধীনতা দিবসের কথা সবাই জানি। কিন্তু তার আড়ালে আরও কতকিছু চাপা পড়ে রইল। এই পনেরোই আগস্ট যে আরও অনেককিছু। সবদিকেই আলো ফেললেন ময়ূখ নস্কর।

ভারত হয়তো নব্বই বছর আগেই স্বাধীন হয়ে যেত। হল না এক সর্বনেশে ১৫ আগস্টের জন্য।

১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট পূর্ব ভারতে চালু হল রেল চলাচল। প্রথম দফায় সেই রেলের যাত্রাপথ ছিল হাওড়া থেকে হুগলী। মধ্যপথে রেল থেমেছিল বালি, শ্রীরামপুর আর চন্দননগরে। এর এক বছর আগেই বম্বে থেকে থানে রেল চালু হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার লাগোয়া হাওড়ায় রেল যোগাযোগ চালু হওয়ার গুরুত্বই ছিল আলাদা। দেশ জুড়ে রেলপথ পাতার সুবিধা ইংরেজরা পেয়েছিল কয়েক বছর পরে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় দ্রুতগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সেনা পাঠাতে পেরেছিল। আধুনিক প্রজুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বিদ্রোহী সিপাহিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দেশ স্বাধীন হল না বটে, কিন্তু ভারতের সমাজ জীবনের খোল নলচে বদলে দিল রেল। এই পরিবর্তনের তার বিবরণ পাওয়া যায় রমাপদ চৌধুরির "প্রথম প্রহর" উপন্যাসে। প্রথম প্রথম সবাই ভেবেছিল "ও গাড়িতে উঠলে জাত যাবে সকলের। বামুন বাগদির তফাত নেই, সব গায়ে গা দিয়ে নাকি বসতে হয়।" সবাই ভেবেছিল, ওই গাড়ির জন্যই নাকি কলেরার মড়ক লেগেছে। তারপর আস্তে আস্তে প্রয়োজনের তাগিদে কুসংস্কার উড়ে গেল। "তারপর ক্রমশ দেখা গেল গ্রামের মেয়েরা রেলগাড়ির পুজো করে ঘরে ঘরে, রেলের দৌলতেই নাকি দুর্ভিক্ষ গেছে দেশ থেকে, খেয়ে পরে বেঁচেছে তারা। "

মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর নতুন করে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হতে হয়তো কিছু দিন দেরি হতো। কিন্তু তার গতি দ্রুত করল দুটি পৃথক ১৫ আগস্ট।

১৮৭২ সালে কলকাতার ঘোষ পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন শ্রী অরবিন্দ। ১৫ আগস্টের জাতক এই ছেলেই একদিন আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবেন, ব্রিটিশের গোলামি করবেন না বলে। বরোদা-রাজের চাকরি ছেড়ে যোগ দেবেন সশস্ত্র সংগ্রামে। তাঁর হাত ধরেই বাঙলার মাটিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটবে। উত্তরকালে সক্রিয় রাজনিতি থেকে আধ্যাত্মিকতায় সরে গেলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে

অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর অবদান। এসবের মধ্যেই ১৮৮৯ সালে উত্তর কলকাতায় স্থাপিত হয় মোহনবাগান ক্লাব। এই ক্লাবের সঙ্গে ইতিহাসের আশ্চর্য সমাপতন। যে বছর ক্লাব প্রথম আই এফ এ শিল্ড জিতল সেই ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ হল। কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হল দিল্লিতে।

ক্লাবের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেল নানা মিথ। ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ের পর, এক সমর্থক নাকি ফোর্ট উইলয়ামের মাথায় উড্ডীন ইউনিয়ন জ্যাকটিকে দেখিয়ে বলেছিল, ‘শিল্ড তো জিতলে, ওটাকে নামাবে কবে?’ উত্তর এসেছিল, ‘যেদিন আবার শিল্ড জিতব সেদিন।‘ কাকতালীয় হলেও মোহনবাগান দ্বিতীয়বার শিল্ড জিতল ১৯৪৭ সালে, আর সেই বছরেই স্বাধীন হল দেশ। বলা বাহুল্য ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৫ আগস্ট।

১৫ আগস্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও কিছু জন্ম ও মৃত্যু। ১৯২৬ সালে কলকাতার কালিঘাটে মামাবাড়িতে যিনি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন, অনেকেই মনে করেছিলেন তিনি কালে কালে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের উত্তরসূরি হয়ে উঠবেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বহুদিন সক্রিয় থাকবে তাঁর কলম। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৩ মে .....

“যাদবপুরের মাঠে শিরীষের ছায়া দীর্ঘ হয় বেলা পড়ে আসে, দেখি মেঘ আনে পরম বিস্ময়।”

যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে বিদায় নিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য।

বিদেশের দিকে চোখ ফেরালে দেখি, ১৭৬৯ সালে এই দিনেই জন্মেছিলেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন।

তবে ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশি বাংলাদেশে যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নজির আছে তাকে এককথায় নোংরামি বলা যায়। এপার বাংলা হোক বা অপার বাংলা- ১৫ আগস্ট মানে তো শুধু স্বাধীনতা নয়- ১৫ আগস্ট মানে দেশভাগের স্মৃতি, ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি। সেই ১৫ আগস্টের গায়ে আরও এক পোঁচ রক্ত লেগেছিল ১৯৭৫ সালে। সেদিন ভোরে ভারত যখন স্বাধীনতা দিবসের আনন্দে মত্ত, তখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে চলছে নারকীয় হত্যালীলা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাসস্থানে চড়াও হয়েছে বিদ্রোহী সেনারা। আততায়ীদের নির্বিচার গুলিতে শেষ হয়ে গেল গোটা পরিবার। সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লেন শেখ মুজিব। নিহত হলেন তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র কামাল, জামাল এবং রাসেল। রাসেলের বয়স তখন মাত্র দশ। বিদেশে থাকায় বেঁচে গেলেন দুই কন্যা হাসিনা এবং রেহানা।

বাংলাদেশের ক্ষমতায় এলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয়। কিন্তু গোলমাল পাকালেন জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি জানালেন, ১৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিন, অতএব ওই দিন তাঁর সমর্থকরা আনন্দ উৎসব করবেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগের ত্রফে বেগম খালেদার এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়। খালেদার বিরোধীরা বলেন, ম্যাট্রিকু-লেশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী, খালেদার জন্মদিন ৯ আগস্ট ১৯৪৫। বিবাহ সার্টিফিকেট অনুযায়ী, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। পাসপোর্ট অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট ১৯৪৫। ১৫ আগস্ট জন্মদিনের সপক্ষে কোনও প্রমান নেই।

বিশ্বের ইতিহাসে আরও চোখ বলালে দেখা যাচ্ছে, শুধু ভারত নয়, আরও অনেক দেশেরই স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্ট। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপানের কবল থেকে স্বাধীন হয়েছিল কোরিয়া, ১৯৪৮-এর এই দিনেই দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ১৯৬০ সালের এই দিনেই ফ্রান্সের অধীনতা থেকে স্বাধীন হয়েছিল রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ১৯৭১ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল বাহরিন।

এবং ভারত। ১৫ আগস্ট স্বাধীন হওয়া দেশ-গুলির তালিকায় কিন্তু ভারতের নাম থাকার কথাই ছিল না। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলি ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু তার বদলে ভারত যে ’৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীন হল, তার জন্য দায়ী ছিল আর এক ১৫ আগস্ট। ১৯৪৫ সালের এই দিনেই মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল জাপান। শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ৬ আগস্ট হিরোশিমা আর ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর জাপানের পক্ষে আর লড়াই চলান সম্ভব ছিল না। ইংরেজরা হয়তো চেয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের মতই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফেলে রেখে যাবে ভারতকে। তাই হাতে এক বছরেরও বেশি সময় থাকলেও নতুন ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেন জানিয়ে দিলেন ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারত ছেড়ে বিদায় হবে ইংরেজ। সঙ্গে হবে দেশভাগ। দেশ যে ভাগ হবেই তা অবশ্য এক বছর আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬-এর ১৫ আগস্টের রাতে ভারতবাসী ধর্মের নামে নিজের নিজের অস্ত্রে শান দিয়েছিল। পরদিন শুরু হয়েছিল ভাইয়ের রক্তে হোলি খেলা। তেলের শিশির মতো ভেঙ্গে গিয়েছিল আমাদের দেশ।

এত বছর পরেও যখন ১৫ আগস্টের কথা ওঠে, আমরা ভুলতে পারি না, ভাঙনের পথে এসেছিল আমাদের স্বাধীনতা, তার গলায় দুলেছিল রক্তমণির হার।

উৎসব থেকে দূরে, একাকী এক সন্ন্যাসী

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

ভারত যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিন কোথায় ছিলেন গান্ধীজি? উত্তরটা হল, কলকাতায়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বেলেঘাটায়।

লালকেল্লায় যখন স্বাধীনতার উৎসব হচ্ছে, গোটা দেশে যখন পতপত করে তেরঙা উড়ছে, তখন স্বেচ্ছা নির্বাসনে জাতির জনক। উৎসব আর কোলাহল থেকে অনেক দূরে। তিনি তখন দুই সম্প্রদায়কে আরও কাছাকাছি আনার সাধনায় মগ্ন।

দেশ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে এসেছিল স্বাধীনতা। মন থেকে তা মেনে নিতে পারেননি গান্ধীজি। সেই যন্ত্রণার কথা দ্ব্যর্থহীনভাষাতেই বারবার বলেছেন। স্বাধীনতার আগের দিন, অর্থাৎ ১৪ আগস্ট কলকাতার মারওয়াড়ি ক্লাবে গান্ধীজি

বলেছিলেন, ‘কাল ইংরেজ শাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব। কাল থেকে আমরা স্বাধীন। কিন্তু আজ রাত থেকে আমার ভারত দু টুকরো হয়ে যাবে।’

তার কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, ‘আমার দেশ আনন্দ করবে। আমি চাই, আপনারাও আনন্দ করুন। কিন্তু আমি সেই আনন্দযজ্ঞে সামিল হতে পারব না। কারণ, এমন স্বাধীনতা তো আমরা চাইনি। এই স্বাধীনতা আগামীদিনে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে বিভাজনের বীজ পুঁতে যাবে। এই অবস্থায় আমি কী করে মশাল জ্বালাতে পারি?’

দেশের নানাপ্রান্তে শুরু হয়ে গেল হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা। একদিকে নেতারা ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারায় মগ্ন। অন্যদিকে এক সম্প্রদায়ের হাতে মরছে আরেক সম্প্রদায়ের নীরিহ মানুষ। গান্ধীজি ১৩ আগস্ট এলেন বেলেঘাটায়। কারণ, এখানে দুই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে মিলেমিশে আছে। গান্ধী এমন একটি জায়গা বেছে নিয়ে গোটা দেশকে এক সম্প্রীতির বার্তা দিতে চাইলেন। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, ‘পাঞ্জাবে দাঙ্গা চলছে। সেখানে দাঙ্গা থামাতে আমরা ৫৫ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছি। বাংলায় শুধু একজন। ওয়ান ম্যান আর্মি। সেই মানুষটা একাই প্রাচীর হয়ে দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছে।’

পনেরোই আগস্ট সেই মানুষটা কোথাও যাননি। বেলেঘাটার গান্ধী আশ্রমে প্রার্থনা করে গেছেন আর একা একা চরকা কেটেছেন। না, সারাদিন কিছুই মুখে তোলেননি। উৎসব থেকে দূরে, একাকী এক সন্ন্যাসী।

এপার বাংলায় উল্লাস ওপার বাংলায় কান্না

দিব্যেন্দু দে

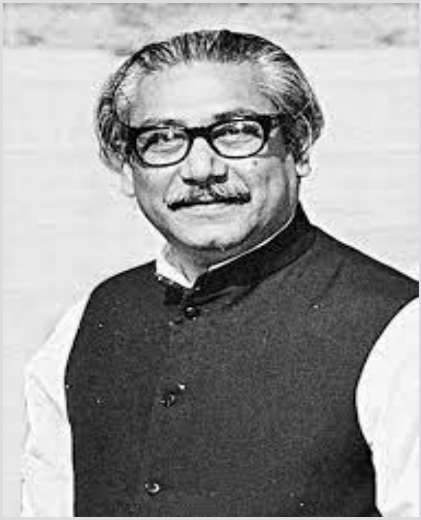

আমাদের কাছে পনেরোই আগস্ট মানে স্বাধীনতা দিবস। আনন্দের দিন। কিন্তু পাশের দেশে ছবিটা অন্যরকম। সেখানে পনেরোই আগস্ট মানে মর্মান্তিক এক হত্যাকান্ড। পনেরোই আগস্ট মানেই ভয়াবহ সেই স্মৃতি। পনেরোই আগস্ট মানে যন্ত্রণার দিন, কান্নার দিন।

১৯৭৫ সালের এই দিনেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে। শুধু তাঁকে হত্যা করেই থেমে থাকেনি জহ্লাদরা। মুজিবের স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই পুত্র-বধুকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করল বাংলাদেশ। নতুন রাষ্ট্রের রূপকার বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের রাস্তায় হেঁটে দেশের নতুন সংবিধান চালু করলেন। আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় কড়া হাতে তা দমন করতে চাইলেন। কিন্তু সেনাবাহনীর একটা অংশ তলায় তলায় ষড়যন্ত্র করেই চলেছিল। ঠিক ছিল, পনেরোই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে যাবেন বঙ্গবন্ধু।

আগের রাত থেকেই তৈরি হয়েছিলেন সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্তা। সঙ্গে পেয়েছিলেন আওয়ামি লিগের বিক্ষুব্ধ কিছু নেতাকে। তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। মুজিবের ধানমন্ডির বাড়ি ঘিরে ফেলে

ঘাতকরা। ষড়যন্ত্র করে আগে থেকেই জাল বিছোনো ছিল। ফলে, তেমন বাধার মুখেও পড়তে হয়নি। ঢোকার মুখেই পেয়ে যায় মুজিব–পুত্র শেখ কামালকে। প্রথমেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হল। বঙ্গবন্ধুকে বলা হল ক্ষমতা ছেড়ে, দেশ ছেড়ে পালাতে। ভাবার জন্য কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হল। বঙ্গবন্ধু ফোনে ডাকলেন কর্নেল জামিলকে। জামিল এসে হামলাকারি সেনাদের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ঘাতকেরা জামিলের কথাও শুনল না। উল্টে গেটের মুখে তাঁকেও গুলি করল। এরপর তারা মুজিবকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। মুজিব তা মানতে অস্বীকার করেন। তখন সিঁড়িতে ওঠার মুখে পেছন থেকে তাঁকেও গুলি করা হয়। মুজিবকে লক্ষ্য করে সবমিলিয়ে ৩৫ টি গুলি ছোঁড়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুজিব লুটিয়ে পড়লেন। মুজিবের স্ত্রী তখন বলেন, আমাকেও তোমরা মেরে ফেল। তাঁর স্ত্রীর দিকে গুলি চালাতেও হাত কাঁপেনি দস্যুদের। মুজিব পুত্র শেক জামাল ও দুই পুত্রবধূকে খুঁজে বের করে খুন করা হল। দশ বছরের ছোট্ট ছেলে রাসেও নিস্তার পেল না মৃত্যুর হাত থেকে।

বেঁচে গিয়েছিলেন দুজন। মুজিবের দুই কন্যা। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। তাঁরা দুজনেই তখন ছিলেন জার্মানিতে। সেই হাসিনা এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের নানাপ্রান্তে আজও পনেরোই আগস্ট পালন করা হয়। যে দিনটা আমাদের কাছে উল্লাসের, সেটাই ওপার বাংলায় কান্নার।

ছিল হাসির গান, হয়ে উঠল প্রার্থনা সঙ্গীত

স্বরূপ গোস্বামী

পাড়ায় আজকাল আর মাইক বাজে না। রেকর্ডের যুগ তো কবেই ফুরিয়েছে। ক্যাসেটও যেন লুপ্তপ্রায় প্রজাতি। তবু গান কিন্তু থেমে নেই। নানা বিবর্তনের পরেও নানা উপলক্ষে সে ঠিক বেজে ওঠে। সে পঁচিশে বৈশাখ হোক বা পয়লা জানুয়ারি। সে ছাব্বিশে জানুয়ারি হোক বা পনেরোই আগস্ট।

আচ্ছা, পনেরোই আগস্ট এলেই কোন বাংলা গানটা সবার আগে মনে পড়ে? বেশি ভাবার দরকার নেই। চটপট বলে ফেলুন, ভারত আমার ভারতবর্ষ। আচ্ছা, এটা কার গান? পাড়ার মোড়ে বা রকের আড্ডায় একটু সমীক্ষা করে দেখুন তো। বিচিত্র সব উত্তর পাবেন। কেউ বলবেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কেউ বলবেন অতুলপ্রসাদ বা রজনীকান্ত। তাও যদি না মেলে, তাহলে বাঙালির চিরন্তন রবি ঠাকুর তো আছেনই। এরপরেও যদি বলেন, উত্তর ঠিক হল না, তাহলে যাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, তিনি আপনার সঙ্গে তর্কও জুড়ে দিতে পারেন।

গানের শেষ স্তবকগুলো একটু মনে করুন। 'রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহান দেশ/ নাহিকো ভাবনা, করি না চিন্তা/ হৃদয়ে নাহি কো ভয়ের রেশ।' রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও এমন লাইন লিখতে পারেন!

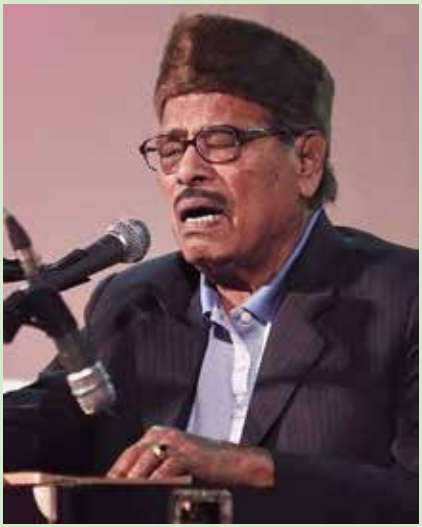

কিন্তু কে শোনে কার কথা! বাঙালি যখনই কোথাও আটকে যায়, ওই একটি ঠাকুরের নাম স্মরণ করে, তা হল রবি ঠাকুর।

অথচ, এই গানের যিনি গীতিকার, সেই শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বছর আগেও আমাদের মাঝে বেঁচে ছিলেন। যিনি সুরকার, সেই অজয় দাস, আর যিনি গেয়েছিলেন, সেই মান্না দে-ও ফেলে আসা দশকে আমাদের মধ্যে ছিলেন। এই গান অন্তত আড়াইশোটি স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীত। স্বদেশ পর্যায়ের গান বলতে প্রথমের সারিতেই উঠে আসে এই গান। পনেরোই আগস্ট বা ছাব্বিশে জানুয়ারি মানেই

কোথাও না কোথাও বেজে উঠবে এই গান।

অথচ, এই গানের জন্মবৃত্তান্ত জানলে আপনাকে অবাক হতে হবে। গানটি কী ভেবে লেখা হয়েছিল? না, দেশাত্মবোধক তো দূরের কথা, কোনও সিরিয়াস মুহূর্তের কথা ভেবেও নয়। বরং কিছুটা কমেডির আদলে। ভাবতে পারেন, সিনেমায় চিন্ময় রায় এই গান গাইবেন, সেই ভেবে গানটি লেখা হয়েছিল!

চারমূর্তি ছবির কথা নিশ্চয় মনে পড়ছে। টেনিদা রূপী চিন্ময়ের কথাও নিশ্চয় মনে আছে! পরিচালক বললেন, ছবিতে টেনিদার লিপে এই গানটি থাকবে। যে টেনিদা প্রচণ্ড সাহসী হওয়ার ভান করে, কিন্তু আসলে প্রচণ্ড ভিতু। সেই টেনিদা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইবে। কী গান তৈরি করা যায়! পরিচালক বললেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার' এই জাতীয় কোনও গানের আদল থাকবে। শিবদাসবাবু লিখতে বসে গেলেন। লিখে ফেললেন ভারত আমার ভারতবর্ষ/ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। অজয় দাস সুরও দিয়ে ফেললেন। রেকর্ড করানো হল মান্না দে-কে দিয়ে।

ছবিটা মুক্তি পেল। কয়েক বছর যেতে না যেতেই গানটা অন্য এক মাত্রা পেয়ে গেল। মুখে মুখে ফিরতে লাগল। এমনকি পনেরোই আগস্ট বাজতে লাগল। সেখান থেকে নানা স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীত হয়ে গেল। কখনও ভেবেছিলেন, এই গান এমন জনপ্রিয়তা পাবে? কথায় কথায় একদিন তাঁর নাকতলার বাড়িতে বসে একদিন জানতে চেয়েছিলাম শিবদাসবাবুর কাছে। প্রবীণ গীতিকার অকপটেই বলেছিলেন, 'শুধু আমি কেন, কেউই ভাবেনি। কী করে যে কী হয়ে গেল! অথচ, যেগুলো খুব সময় নিয়ে লিখি, সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছয় না।' এই গানকে ঘিরে অনেক অভিমান ছিল শিবদাসবাবুর। তাঁর পাড়ায় বা আশেপাশে বাজত এই গান। পতাকা তুলতেন কাউন্সিলর বা ক্লাবের সেক্রেটারি। অথচ, তাঁকে কেউ মঞ্চে ডাকত না। শেষেরদিকে বেরোতে পারতেন না। মাইকেই শব্দ কানে আসত। টিভি চালালেও কোনও না কোনও চ্যানেলে বেজে উঠত এই গান। কিন্তু কেউ গীতিকারের খোঁজ রাখেননি। একবুক অভিমান নিয়েই চলে গেছেন।

প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল অজয় দাসের ক্ষেত্রেও। তিনি যে এমন এক কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া গানের সুরকার, সেটা কজনই বা জানতেন! অজয় দাসের নাম যাঁরা জানেন, তাঁরা পরের লাইনেই জুড়ে দেন, সুখেন দাসের ভাই। যেন নিজস্ব কোনও পরিচিতি নেই! তাঁকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম এই গানের কথা। বলেছিলেন, 'মান্নাদা নিজেও বুঝতে পারেননি। নিছক মজার ছলেই সুর করা হয়েছিল। কিন্তু এই গান যে এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, কে জানত! কাউকে বলি না, এই গান আমার সুর করা। কারণ, লোকে হয়ত বিশ্বাসও করবে না। ভাববে মিথ্যে বলছি।'

শিবদাসবাবু চলে গেছেন, অজয়বাবুও নেই। মান্না দেও নেই। হারিয়ে গেলেন চিন্ময়ও। বাঙালি শিকড় হারিয়ে এক অজানা পথে ছুটবে। বিনোদনের কত অজানা দিক হাজির হয়ে যাবে। দেশপ্রেমের কত নতুন আঙ্গিক বেরিয়ে আসবে। তবু পনেরোই আগস্ট এলেই বাঙালিকে শুনতেই হবে এই গান।

না বোঝা সেই স্বাধীনতাটাই ঢের ভাল ছিল

অন্তরা চৌধুরি

ছোটবেলায় স্বাধীনতা দিবস কাকে বলে অত বুঝতাম না। স্কুলে সেদিন ক্লাস হবে না। কিন্তু ভোরবেলায় উঠে একবার স্কুল যেতে হবে। কারও খালি হাতে যাওয়া চলবে না। সবাইকেই বাড়ি থেকে অল্প করে হলেও ফুল নিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতা দিবস মানে আরও পাঁচটা ছুটির দিনের মতই। আলাদা কোনও বিশেষত্ব ছিল না।

ভোরবেলায় উঠে একটা প্লাস্টিকে অনেক রকম ফুল নিয়ে স্কুলে যেতাম। হেডমাস্টার মশাই নির্দিষ্ট সময়ে পতাকা উত্তোলন করতেন। পতাকার ভেতরে থাকত হরেকরকম ফুল। সেগুলো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ত। শিশুমন অবাক হয়ে যেত। তারপরেই হত জাতীয় সঙ্গীত। বন্দেমাতরম শ্লোগান। কী বলছি, কেন বলছি অত বুঝতাম না।

স্যাররা সবাই বক্তৃতা দিতেন। এক কান দিয়ে ঢুকত এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। শুধু ভাবতাম, কতক্ষণে চকলেট দেবে! সবশেষে চকলেট বিতরণের পালা। তখনকার দিনে বাংলা পাঁচের মতো দেখতে একরকম চকলেট পাওয়া যেত। সেই চকলেট সকলকে চারটে করে দেওয়া হত। সেই চারটে চকলেট নেবার জন্য সে কী আকূল প্রতীক্ষা! একটা খেতে খেতে আসতাম। আর বাকিগুলো হাতে ধরাই থাকত বাড়ি গিয়ে খাব বলে। কিন্তু বাড়ি যখন পৌঁছতাম তখন সেগুলো প্রায় গলে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট হাতে চকলেটের ঝোল। ইস! এখন ভাবলে কেমন লাগে।

আরেকটু উঁচু ক্লাসে তখন দিত লুচি, আলুর-দম আর বোঁদে। বিচ্ছু ছেলের অভাব কোনও কালেই আমাদের সমাজে ছিল না। সবাই খেয়ে দেয়ে নিজেদের মধ্যে শ্লোগান দিতে দিতে বাড়ি যেত-

‘বন্দেমাতরম বোঁদে খেয়ে পেট গরম’।

আমরা মুখ টিপে সবাই হাসতাম। এদের মধ্যে কিছু একেবারে বখে যাওয়া ছেলে ছিল।

তারা আবার আরেককাঠি ওপরে শ্লোগান দিত-

‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা
ছাগলের পঁচিশটি বাচ্ছা
আআআআআআআআআ’

নিছক মজা। কাউকে অসম্মান করার জন্য তারা নিশ্চয় এসব বলত না। কী ভালই না ছিল না বুঝে পালন করা সেই স্বাধীনতা দিবস! মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই না বোঝার দিন-গুলোই বোধ হয় ভাল ছিল। কেন যে বেশি বুঝতে গেলাম!

মোহনবাগানের সঙ্গেও জড়িয়ে গেল তারিখটা

সোহম সেন

মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি তারিখ। নিশ্চয় প্রথমেই ২৯ জুলাইয়ের কথা মাথায় আসছে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, এই দিনটিকেই মোহনবাগান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনই ধুমধাম করে নানা অনুষ্ঠান নয়। এই দিনই মোহনবাগান রত্নও দেওয়া হয়। এই দিনেই প্রাক্তন-বর্তমানের পুনর্মিলন হয়।

কিন্তু গুগল বাবাজির সাহায্যে একবার মোহনবাগানের পেজে ঢুকুন। দেখবেন ১৫ আগস্ট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস। অথচ, দিনটার কথা অনেকেই জানেন না। খোদ মোহনবাগানের সদস্য-সমর্থকদেরও অনেকেই জানেন না এই তারিখটির অস্তিত্বের কথা। আসলে, কাগজ-কলমে যতই দিনটিকে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হোক, এই দিনটির সঙ্গে মোহন-জনতার নাড়ির সেই যোগসূত্র কখনও তৈরিই হয়নি।

তাহলে, কীভাবে এল এই ১৫ আগস্ট? নানা গল্প চালু আছে। তবে সবথেকে বেশি যে কারণটা শোনা যায়, তা হল, এই তারিখটি মোহনবাগান সভাপতি ধীরেন দে-র তৈরি করা। মোহনবাগানের শতবর্ষ পালন হয়েছিল বেশি ঘটা করেই। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে। তিনি এসেওছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে মোহনবাগানকে জাতীয় ক্লাব বলে উল্লেখ করেন। শোনা যায়, সেই থেকেই নাকি জাতীয় ক্লাব শব্দদুটো মোহনবাগানের সঙ্গে জুড়ে যায়।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। প্রধানমন্ত্রীকে

যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তখন ধীরেন দে-কে বলা হয়েছিল, কবে ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়, সেই তারিখ লিখতে। সত্যিই তো দিনক্ষণ দেখে এই ক্লাব তৈরি হয়নি। ঘটনা করে প্রতিষ্ঠাও হয়নি। তাই বিশেষ কোনও দিনকে চিহ্নিত করা মুশকিল। তখন ধীরেন দে বুদ্ধি করে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে লিখে দিলেন ১৫ আগস্ট তারিখটা। সেই থেকে এই তারিখটাই থেকে গেল প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে।

বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, নেতাজিকে চেনেন!

কাউকে মহান করতে গিয়ে অন্যদের ছোট করতে বাঙালির জুড়ি নেই। নেতাজিকে মহান করতে গিয়ে আমরা কত লোককে অহেতুক ছোট করি। আমাদের যত আগ্রহ নেতাজির মৃত্যু নিয়ে। কথা বললেই বোঝা যায়, নেতাজি সম্পর্কে এঁরা প্রায় কিছুই জানেন না। লিখেছেন সুমিত চক্রবর্তী।।

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই একটা পোস্ট চোখে পড়ে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ছাপা টাকায় গান্ধীজির পরিবর্তে নেতাজির ছবি ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের আরও একটি পোস্ট হল, চে গেভারার ছবিওয়ালা টি শার্ট না পরে, ভগত সিং-এর ছবিওয়ালা টি শার্ট পরুন।

এইসব পোস্টে চটপট লাইক ও কমেন্ট পড়তে থাকে। কিন্তু আমরা যারা নেতাজি বা ভগত সিং-এর ছবি ছাপানোর দাবিতে এত সরব তারা নেতাজি সম্বন্ধে কতটুকু জানি। কতটুকু জানি ভগত সিং সম্পর্কে? একবার আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা নেতাজিকে ধর্মীয় প্রার্থনা সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। এই গান শুনে ক্রুদ্ধ নেতাজি বলেছিলেন, "কে এই সব লোক দেখানো চমক শিখিয়েছে?" তিনি আরও বলেছিলেন, "আমাদের আন্দোলনের ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ, এর চরিত্র রাজনৈতিক। এর সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলবে না।"

নেতাজি সিঙ্গাপুরের একটি মন্দিরে প্রবেশ করতে চাননি। কারণ সেই মন্দিরে সব ধর্মের মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। এমনকি নিচু জাতের হিন্দুদেরও ঢোকা নিষেধ ছিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর, সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন।

নেতাজির জীবনের এই সব ঘটনার কথা আমরা প্রায় কেউই জানি না। আমরা জানি না, ভগত সিং নিজে নাস্তিক ছিলেন, তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। যারা ভগত সিংকে সত্যিই শ্রদ্ধা করেন, তারা কখনই চে গেভারার ছবির বিরোধিতা করবেন না। যারা নেতাজিকে শ্রদ্ধা করেন তারা কখনই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলবেন না।

টাকার নোটে নেতাজির ছবি ছাপানো বা টি-শার্টে ভগত সিং-এর ছবি ছাপানোর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করা। অবশ্য এই বাংলায় নেতাজি প্রেমের একটা সহজ সূত্র আছে। গান্ধীজিকে গালাগাল দাও, তাহলেই তুমি নেতাজির অনুরাগী। এরা না পড়েছে গান্ধী, না পড়েছে নেতাজি। জিজ্ঞেস করুন, দু লাইনের বেশি বলতে পারবেন না। হায় রে, জাতির জনক নামটা কার দেওয়া, সেটাও এরা জানে না।

বিভূতিভূষণ এখানে কখনও খেতে আসেননি

দিব্যেন্দু দে

একেবারেই সাম্প্রতিক একটি ওয়েব সিরিজ— রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি। পূর্ববঙ্গের একটি হোটেলের পটভূমি। সেই ভাতের হোটেলকে ঘিরে নানা ওঠা-পড়া। কিন্তু নামকরণেই রয়েছে অদ্ভুত এক চমক।

তেমনই একটি হোটেলের কথা। রানাঘাটের আদর্শ হিন্দু হোটেল। রানাঘাট স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়েই চোখে পড়বে এই হোটেলটি। মনে পড়ে যাবে বিভূতিভষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এই রানাঘাট স্টেশন সংলগ্ন একটি ভাতের হোটেলকে নিয়ে লেখা তাঁর কালজয়ী উপন্যাস— আদর্শ হিন্দু হোটেল। সেই হাজারি ঠাকুর। সেই পদ্ম ঝি। আরও কত চরিত্র। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আটের দশকের শেষদিকে চমৎকার একটা সিরিয়ালও হয়েছিল। মনোজ

মিত্র, সাবিত্রী চ্যাটার্জির সেই অভিনয়ের কথা এখনও মুখে মুখে ফেরে।

অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল এই হোটেলে একদিন খাওয়ার। কিন্তু নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে, একদিন সুযোগটা এসেই গেল। গিয়েছিলাম কৃষ্ণনগর। ফেরার পথে কী মনে হল, নেমে পড়লাম রানাঘাটে। অন্য কোনও কারণে নয়। স্রেফ ওই হোটেলে একদিন খাব বলেই। এই হোটেলকে নিয়ে এমন কালজয়ী উপন্যাস! মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা শিহরণ কাজ করছিল। দোকানে বেশ ভিড় ছিল। ফলে, শুরুতে মালিকের সঙ্গে বা কর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার তেমন সুযোগ ছিল না। এত খদ্দেরের ভিড়ে দোকানের ইতিহাসের কথা বলতে হলে তাঁরা হয়ত বিরক্তই হতেন। সত্যিই তো, একই ইতিহাস কতবারই বা বলবেন!

নীচে এখন একটা মিষ্টির দোকান। নাম আদর্শ সুইটস। পাশ দিয়ে গেছে সরু সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয় দো'তলায়। বেশ ছিমছাম, সাজানো। বিভূতিবাবুর ছবি টাঙানো। এখান থেকে স্টেশন দেখা যায়। ট্রেনের আসা-যাওয়াও দেখা যায়। বিভূতিবাবুর ভাবনায় নিশ্চয় এমন দোতলা ছিল না। সেখানে ছিল দরমার বেড়া। খড়ের ছাউনি। কলাপাতা। স্টেশন থেকে খদ্দের ডেকে আনতে হত। হাজারি ঠাকুরের রান্নার এমনই সুখ্যাতি, খদ্দেররা ঠিক ভিড় জমাত।

কিন্তু যা হয়! লোকের অধীনে কাজ করতে গিয়ে নানান সমস্যা। এমনকী চুরির অপবাদও মাথায় নিতে হল। হাজারি ঠাকুরের অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল নিজের একটা হোটেল তৈরি করবেন। সেখানে নিজের হাতে রান্না করে খদ্দেরদের খাওয়াবেন। কোনও খদ্দেরকে ঠকাবেন না। কিন্তু তাঁর সেই সামর্থ্য কই? এদিক-ওদিক থেকে টাকার জোগাড় হয়ে গেল। স্টেশনের গায়েই তৈরি হল আদর্শ হিন্দু হোটেল। মালিক হওয়া সত্ত্বেও ক্যাশবাক্স নয়, তাঁর ঠিকানা সেই রান্নাঘর।

আমি কোনওকালেই রাঁধুনি নই। চা, চাউমিন, কাজ চালানো খিচুড়ি, ডিম ভাজা— এই আমার রান্নার দৌড়। বেশি সময়ও নেই, সেই নিষ্ঠাও নেই। কিন্তু নিজের কাজটা বরাবরই যত্ন নিয়ে করি। তাই হাজারি ঠাকুরের সঙ্গে নিজের কোথায় একটা মিল পেতাম। সেই কারণেই হয়ত এই উপন্যাসটা আমার এত প্রিয়। সেই কারণেই রানাঘাটের এই হোটেলে একদিন

ভাত খাওয়ার এমন তীব্র ইচ্ছে।

দোকানে একইসঙ্গে ঐহিত্য আর আধুনিকতার মিশেল। দিনের বেলায় এখনও সেই সাবেকি ভাতের হোটেল। কলাপাতা নেই, তবে কাগজের প্লেটে কলাপাতার আদল আছে। ভাত, ডাল, নানা রকমের তরকারি, ভাজাভুজি। পাঁঠার মাংস। সঙ্গে নানা রকমের মাছ। তবে সন্ধের পর চেহারা অন্য-রকম। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তখন মোগলাই, চাইনিজের হরেক আয়োজন। দাম যে খুব বেশি, তাও নয়। মোটামুটি অন্যান্য রেস্তোরাঁর মতোই।

আচ্ছা, হাজারি ঠাকুর থাকলেও কি আজ এভাবেই চাইনিজ, মোগলাই করতেন? হয়ত করতেন। কারণ, উপন্যাস পড়ে যেটুকু মনে হয়েছে, তিনি সময়ের দাবি বুঝতেন। খদ্দেরের চাহিদা ও তৃপ্তির কথা বুঝতেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই ভালবাসতেন। তাই তিনিও হয়ত চাইনিজ, মোগলাই আয়ত্ব করে নিতেন। ভাত, ডাল, মুড়ি ঘণ্টের সঙ্গে যখন সর্ষে ইলিশ দিয়ে গেল, মনে হচ্ছিল ভেতরে বোধ হয় সেই হাজারি চক্কোত্তি মশাই রান্না করছেন।

না, বিভূতিবাবুর সময় সত্যিই এই হোটেল ছিল না। তবে এই বাড়ির সঙ্গে

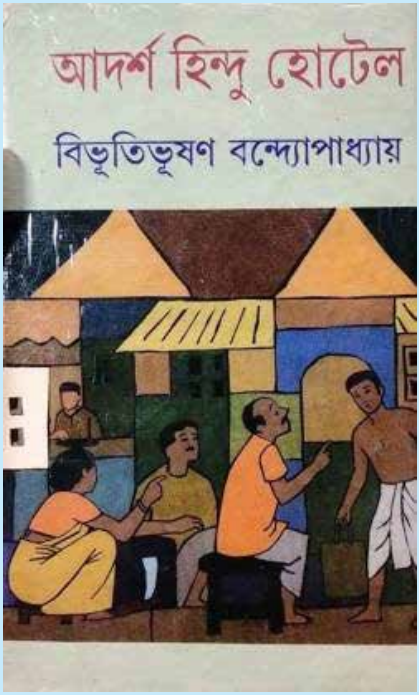

তাঁর একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এটা ছিল তাঁর মাসির বাড়ি। মাঝে মাঝেই পথের পাঁচালির স্রষ্টা এই বাড়িতে আসতেন। থাকতেন। কখনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে লোকজনের আসা যাওয়া দেখতেন। আবার কখনও হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন চূর্ণী নদীর দিকে। আশপাশের কিছু হোটেল হয়ত দেখেওছিলেন। মনে মনে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই কালজয়ী উন্যাস।

এই দোকানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই গোপীনাথ কুণ্ডু অবশ্য প্রথমে উপন্যাস

পড়েননি। বিভূতিবাবুর মৃত্যুর পর এই উপন্যাস নিয়ে একটি নাটক হয়েছিল। কলকাতায় একবার সেই নাটকটি দেখেন। তখনই নামটি মাথায় গেঁথে যায়— আদর্শ হিন্দু হোটেল। এখন যেখানে, সেখানে নয়, এখান থেকে একটু দূরে। তখন ছিল মাটিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। পরে বিভূতি বাবুর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটা কিনে নিলেন। এখানেই উঠে এল আদর্শ হিন্দু হোটেল। অনেকেই ভাবতেন, এই হোটেলেই হয়ত বিভূতিভষণ খেতেন। বা এই হোটেলকে ঘিরেই তিনি হয়ত ওই উপন্যাস খানা লিখেছেন। কিন্তু আসল সত্যিটা হল, উপন্যাসটা লেখার পর, বিশেষত সেটা নাটক হওয়ার পর, এই নামের হোটেলটি তৈরি হয়। পরে আটের দশকে এই কাহিনী নিয়ে জনপ্রিয় সিরিয়াল হয়। ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় আদর্শ হিন্দু হোটেলের কথা। আশপাশের অনেকেই তখন এখানে খেতে আসতেন। যেমন এখনও আসেন। আর যেহেতু বাইরে থেকে এত খদ্দের স্রেফ এই নামটার জন্যই আসে, তাই মানটাও ধরে রাখতে হয়েছে। হাজারি চক্কোত্তির মতো না হোক, অন্তত ভাল মানের রাঁধুনি রাখতে হয়েছে। তাই ভাত –ডালের হোটেলে সীমাবদ্ধ না থেকে চাইনিজ–মোগলাইয়ের আমদানি করতে হয়েছে।

গোপীনাথবাবু নেই। তাঁর ছেলে অমরনাথ কুণ্ডু এখন ক্যাশবাক্সে বসেন। চাইলে একটু জল মেশাতেই পারতেন। বলতেই পারতেন, এখানে বিভূতিভূষণ খেতেন। কিন্তু তিনি সত্যিটাই বলেন। তিনি অকপটেই বলেন, 'বিভূতিবাবু এই হোটেল দেখে যাননি। তখন এই হোটেল ছিলও না। তাঁর এই উপন্যাসের নাম অনুসারে আমার বাবা এই হোটেল তৈরি করেন।' চারিদিকে যখন বাড়িয়ে বলার হিড়িক, তখন ষাট বছরে একটু জল মেশাতেই পারতেন। কোথাও একটা সংযম ধরে রেখেছেন। জানেন, কতটুকু বলতে হয়। কোনটা বলতে নেই। এই সংযমটা কজনের থাকে!

বিভূতিভূষণ আসুন আর নাই আসুন, এই নামটার একটা বাড়তি আকর্ষণ তো আছেই। এই বাংলায় এমন নামের হোটেলের অভাব নেই। সব জেলাতেই পাবেন। কিন্তু রানাঘাট স্টেশনের বাইরেই। সেই বাড়িতেই। আশপাশের অনেক ছবিও দিব্যি মিলে যায়। সাহিত্যের একটা গন্ধ তো আছেই। আমিও তো গিয়েছিলাম সেই গন্ধের টানেই।

আহারে বাহারে

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— আহারে বাহারে। এই বিভাগে থাকবে বিভিন্ন হেরিটেজ হোটেল, রেস্তোরাঁ বা খাবারের কথা। সেটা রেস্তোরাঁ না হয়ে চা, সরবত বা মিষ্টির দোকানও হতে পারে।

কলকাতার নানা প্রান্তে এমন কত দোকান ছড়িয়ে আছে। জেলায় জেলায় এমন কত প্রাচীন দোকান ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের গন্ধ মাখা সেইসব দোকান বা খাবারের কথা আপনিও লিখতে পারেন। সেই দোকানের ঐতিহ্যের পাশাপাশি মিশে থাকুক আপনার অনুভূতিও। লেখার সঙ্গে ছবিও পাঠাতে পারেন।

লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

শ্রদ্ধায়
স্মরণে

কর্মাটাঁড়ের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার

শাক্য সেন

মংপুতে তিনবার গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। থাকতেন মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে। বাড়িতে না বলে কোয়ার্টারে বলাই ভাল। মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী চাকরি করতেন কুইনাইন ফ্যাক্টরিতে। তাঁর বাংলোতেই অতিথি হয়ে উঠতেন বিশ্বকবি। তখন জীবনের প্রান্তবেলা। ঘুরে বেড়ানোর তেমন সামর্থ্য নেই। পাহাড়ি সেই জনপদে বাঙালি প্রায় ছিল না বললেই চলে। অধিকাংশই নেপালি। ফলে, রবীন্দ্রনাথ কী লেখেন, সেসব বোঝা তাঁদের কম্ম নয়। তবু সকাল থেকেই বাড়িতে ভিড় লেগে যেত। আসলে, কবির কাছে নয়, তাঁরা আসতেন ডাক্তারের কাছে। এখানে রবি ঠাকুরের পরিচিতি ছিল হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসেবে। তিনি এই পাহাড়ি মানুষদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, ওষুধ দিতেন।

বিশ্বকবির সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী বিদ্যাসাগরের এই ব্যাপারটায় খুব মিল। তিনিও শেষ জীবনে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারই হয়ে উঠেছিলেন। সেটাও কলকাতা থেকে অনেক দূরে, কর্মাটাঁড়ে। সেই কর্মাটাঁড় দীর্ঘদিন ছিল বিহারে। রাজ্য ভাগের পর তা এখন ঝাড়খণ্ডে। বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের সতেরোটা বছর কেটেছে এই আদিবাসী অধ্যুসিত গ্রামে। আর এখানে তিনি বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়। কিংবদন্তি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার (যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিকিৎসক হিসেবেও খ্যাত) বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিদ্যাসাগরও সরকার মশাইকে নানা সেবামূলক কাজে টাকা তুলে দিতেন।

সেইসঙ্গে বিদেশি বই পড়ে টুকটাক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও আয়ত্ব করেছিলেন। যার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেছিল সেই কর্মাটাঁড়ে।

হঠাৎ কর্মাটাঁড়ে গেলেনই বা কেন? বলা যায়, নিজের গ্রাম আর কলকাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে। বিদ্যাসাগর বলতেই উঠে আসে তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের কথা। কিন্তু ঘটনা হল, এই বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন ইশ্বরচন্দ্র। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এই গ্রামে আর কখনও ফিরবেন না। সেই প্রতিজ্ঞার পরেও তিনি আরও ৩২ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর কখনই নিজের গ্রামে পা রাখেননি। কলকাতা সম্পর্কেও একইরকম বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে শহুরে শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে যেভাবে কটাক্ষ, বিদ্রুপ ও পদে পদে বাধা পেয়েছেন, তা তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করেছিল। অনেকেই জানেন, বিদ্যাসাগর নিজের ছেলের সঙ্গে এক বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গেও একসময় সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৭২ সাল নাগাদ ছেলেকে তাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। স্ত্রীও মারা গেলেন। অনেকটাই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর। কলকাতায় কিছুতেই আর মন টিকছিল না। এদিকে, গ্রামের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন। ঠিক করলেন, বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়ে একেবারে কোনও প্রান্তিক গ্রামে গিয়ে থাকবেন।

প্রথমে ঠিক ছিল, তিনি দেওঘরে থাকবেন। একটি বাড়িও দেখেছিলেন। প্রাথমিকভাবে পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু বাড়িওয়ালা এমন দাম হাঁকলেন, তিনি পিছিয়ে গেলেন। শেষমেষ বেছে নিলেন দেওঘর থেকে কিছুটা দূরে, কর্মাটাঁড়। আদিবাসী ভাষায় টাঁড় মানে, উঁচু জমি, যেখানে জল দাঁড়ায় না। আর কর্মা নামে এক মাঝি ছিলেন। মোদ্দা কথা, কর্মা মাঝির উঁচু জমি। সেখানে এক ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে

১৪ বিঘা জমি কিনেছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি সেই জমি বিক্রি করে দেন। কিনে নিলেন বিদ্যাসাগর। তখনকার দিনে খরচ পড়েছিল ৫০০ টাকা। সেই জমিতে নিজে একটি বাড়ি তৈরি করলেন। নাম দিলেন নন্দনকানন। একটি শোবার ঘর, একটি পড়াশোনার ঘর। আরেকটি বড় হল ঘর। সেখানে রাতে বয়স্কদের লেখাপড়া শেখাতেন।

কর্মাটাঁড়ে এসেই বিদ্যাসাগর বুঝলেন, এত বড় এলাকায় কোনও ডাক্তার নেই। এখানে লেখাপড়া শেখানোর চেয়েও চিকিৎসা বেশি জরুরি। তাই সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল ডাক্তারখানা। মোটামুটি সকাল দশটা পর্যন্ত চলত এই পর্ব। ভিজিট নেওয়া তো দূরের কথা। ওষুধও নিজেই বানিয়ে দিতেন। সেই সঙ্গে কোনও কোনও রোগীর পথ্যও তৈরি করে দিতে হত। সাগু, বাতাসা, মিছরি নিয়েই বসতে হত। এখানেই ডাক্তারি শেষ নয়। বিকেল দিকে বাড়ি বাড়ি গিয়েও চলত ডাক্তারি। আর সন্ধের পর গ্রামের বয়স্কদের নিয়ে স্কুল। এভাবেই দিন কেটে যেত। এই আদিবাসীদের সান্নিধ্য বেশ ভালই লাগত বিদ্যাসাগরের। এ নিছক কয়েক মাসের সমাজসেবা নয়। শেষ জীবনের সতেরোটা বছর এভাবেই কেটেছে। ভাবা যায়, বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষ কিনা শেষ সতেরোটা বছর (১৮৭৩—১৮৯০) কাটিয়ে ছিলেন একেবারে আদিবাসীদের গ্রামে!

মাঝে মাঝে কলকাতা আসতেন ঠিকই। সেটা মূলত চিকিৎসার কাজে। তাও অল্প দিনের জন্য। ফিরে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতেন ওষুধ, ফল, জামাকাপড়। বিদ্যাসাগর কর্মাটাঁড়ে ফিরলেন মানেই গ্রামর মানুষের প্রত্যাশার শেষ নেই, ‘এই বিদ্যেসাগর, কী এনেছিস?’ পুজোর আগে গ্রামের প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যেতেন। কারও জন্য শাড়ি, কারও জন্য লুঙ্গি, কারও জন্য জামা। শেষ একটা বছর অবশ্য খুবই অসুস্থ ছিলেন। ফিরে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। সেখানেই মৃত্যু (১৮৯১)। যে পুত্রকে তাজ্যপুত্র করেছিলেন, সেই নায়াণচন্দ্র এবার

কর্মাটাঁড়ে এলেন সম্পত্তির দখল নিতে। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, সম্পত্তি বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যাবে, সেটাই তাঁর কাছে বড় প্রশ্ন। বিক্রি করলেন কলকাতার মল্লিক পরিবারকে। সেই পরিবারও জায়গাটা নিয়ে ফেলেই রাখল।

অনেক পরে এগিয়ে এল বিহার বাঙালি সমিতি। স্বাধীনতার আগেই তাঁরা মল্লিক পরিবারের কাছ থেকে সেই জমি ও বাড়ি কিনে নিলেন। চালু করলেন একটি মেয়েদের স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়। ১৯৭৮ সাল নাগাদ মূলত তাঁদের দাবিতেই কর্মাটাঁড় স্টেশনের নাম হয়ে গেল বিদ্যাসাগর। গত বছর ঝাড়খণ্ড সরকার ঘোষণা করেছে পুরো কর্মাটাঁড় থানা ও ব্লকও বিদ্যাসাগরের নামে হয়ে যাবে। সেই বাড়ি, সেই স্কুল আজও আছে। আজও আছে বিদ্যাসাগরের লাগানো সেই আমগাছ। পাশে তৈরি হয়েছে গেস্ট হাউস।

ইতিহাস বিস্মৃত জাতি হিসেবে বাঙালির বিশেষ একটা ‘সুনাম’ আছে। ইতিহাস তাঁর ভেতর রোমাঞ্চ আনে না। তাঁকে শিহরিত করে না। তাই বছরভর বাঙালি এত এত জায়গায় বেড়াতে যায়, তাঁদের কজনই বা আসেন এই কর্মাটাঁড়ে! আপনার পরিচিত একশো জনের মধ্যে খোঁজ নিন। দেখুন, একজনও সেখানে যাননি। একশো জনের মধ্যে অন্তত আঠানব্বই জন ‘কর্মাটাঁড়’ নামটাই শোনেননি।

যেখানে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ সতেরোটা বছর কাটিয়েছিলেন, সেখানে বাঙালি একদিনের জন্যও যেতে পারে না! ২০০ বছরের জন্মদিনে আমরা ফেসবুকে ছবির বন্যা বইয়ে দিই। কিন্তু একটা ছুটির দিন দেখে একটু কর্মাটাঁড় ঘুরে আসা যায় না!

পুরনো সিরিয়াল ফেরানো যায় না!

বৃষ্টি চৌধুরি

বাঙালির দুটি বড় অসুখ। এক, মোবাইল। দুই, সিরিয়াল। এই দুটো নিয়েই মেতে আছে গড় পড়তা বাঙালি। আর কোনও দিক নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। এখন সিরিয়ালের নামে যা হচ্ছে, তা অত্যন্ত নিম্নরুচির। না আছে সাহিত্য, না আছে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ। সবাই ড্রয়িংরুমে সারাদিন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের গা ভর্তি গয়না। ঘরের মধ্যে কেউ এমন পোশাকে থাকে? এমন দামি শাড়ি পরে থাকে? এই প্রশ্নগুলোই উঠে এসেছে বেঙ্গল টাইমসের বিভিন্ন লেখায়। এবারেই সঙ্গত প্রশ্ন।

অথচ, সিরিয়াল মানে কিন্তু এমনটা ছিল না। বছর দশেক আগেও বেশ উপভোগ্য কিছু সিরিয়াল হত। এখন যাঁরা সিরিয়ালে সকাল থেকে সন্ধে ডুবে আছেন, তাঁদের প্রতি সত্যিই করুণা হয়। তাঁরা আসল সিরিয়ালের স্বাদ বোধ হয় পাননি। বিভিন্ন টিভি চ্যা-নেলের কাছে আমার আবেদন, এইসব নতুন সিরিয়াল না দেখিয়ে দু-একটা পুরানো সিরিয়ালকে রিপিট করা যায় না? হিন্দিতে কিন্তু এই প্রবণতা আছে। আটের দশকের রামায়ণ বা মহাভারতকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এমনকি হামলোগ, বুনিয়াদ বা মালগুডিউ ডেজ-এর মতো সিরিয়ালকে আবার দেখানো হচ্ছে। তাহলে আটের দশকের 'তের পার্বণ' বা 'সেই সময়' ফিরতে বাধা কোথায় ?

আমাদের কিশোরীবেলার একের পর এক ভাল সিরিয়ালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রবি ঘোষের দুটি অসাধারণ সিরিয়াল ছিল – গোয়েন্দা ভগবান দাস, অভিনন্দন ভগীরথ। মনোজ মিত্র, সাবিত্রী চ্যাটার্জির 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এর কথা এখনও মনে পড়ে। সাহিত্য নির্ভর আরও কত অসাধারণ সিরিয়াল, যেগুলি আমাদের সাহিত্য পড়ার খিদেকে উস্কে দিয়েছিল। এখনকার মতো রোজ হত না। সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন। সেই অপেক্ষায় বসে থাকতাম। সেই অপেক্ষার আনন্দই ছিল আলাদা।

নতুন সিরিয়াল নির্মাণ করতে যা খরচ, পুরানো সিরিয়াল দেখাতে সেই তুলনায় কোনও খরচই নেই। যেটুকু খরচ, আশা করি বিজ্ঞাপন থেকে নিশ্চয় উঠে যাবে। যাঁরা সারাদিন সিরিয়াল দেখিয়ে বাণিজ্য করছেন, তাঁরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

ছৌ মুখোশের চড়িদা গ্রামে একটি দিন

ছৌ নাচের কথা কে না জানেন! কোথায় তৈরি হয় সেই ছৌ–মুখোশ? অযোধ্যার লাগোয়া সেই চড়িদা গ্রাম থেকে ঘুরে এসে লিখলেন বুবুন ঘোষাল।

পুরুলিয়া বললেই সবার আগে কোন ছবিটা ভেসে ওঠে। যারা শিক্ষা অনুরাগী, তাঁরা হয়ত বলবেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। যাঁরা ঘুরতে ভালবাসেন, তাঁরা হয়ত বলবেন অযোধ্যা পাহাড়ের কথা। হ্যাঁ, এই দুটোর কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে গেছে, এমন কোনও বিষয়? এমন কোনও লোকসংস্কৃতি? আর ক্লু দেওয়ার দরকার নেই। ছৌ নাচের ছবিটা এতক্ষণে নিশ্চয় মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে। হ্যাঁ, এই ছৌ নাচের কথা বললে, এককথায় ভেসে ওঠে পুরুলিয়া জেলার নাম।

কিন্তু এই ছৌ মুখোশ কোথায় তৈরি হয়? হঠাৎ করেই সেই গ্রামে যাওয়ার সুযোগটা এসে গেল। আমরা গিয়েছিলাম পর্বতারোহনের প্রশিক্ষণ শিবিরে। এত

কাছে এলাম। আর ছৌ গ্রাম চড়িদায় যাব না? বাঘমুন্ডি থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। কয়েকটা বাইক নিয়ে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম চড়িদার পথে। গ্রামটা যে খুব আহামরি, এমন নয়। দক্ষিণ বঙ্গের আর দশটা গ্রাম যেমন হয়ে থাকে, অনেকটা সেরকমই। ছোট্ট গ্রাম। গোটা তিরিশেক পরিবার। সব পরিবারই কোনও না কোনওভাবে এই ছৌ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই গ্রামে যে মুখোশ তৈরি হয়, সেটাই পৌঁছে যায় দেশের নানা প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও।

গ্রামের মানুষগুলি বেশ সাধাসিধে। মুখোশ বানালেও ওদের মুখে কোনও মুখোশ নেই। একটু কান পাতলেই ওদের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবেন। বংশ পরম্পরায় চলছে ঠিকই। কিন্তু কতদিন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, ওঁরা নিজেরাও সংশয়ে। এক প্রবীণ শিল্পী বলছিলেন, আমাদের তৈরি মুখোশ বিদেশে মোটা দামে বিক্রি হয় শুনেছি। কিন্তু সেই টাকা তো আমাদের ঘরে আসে না। কাদের কাছে যায়, কে জানে!

মূলত কাগজ আর আঠা দিয়েই তৈরি হয় এই মুখোশ। গ্রামের ৪–৫ বছরের শিশু যেমন কাজ করছে, তেমনি ৮০

বছরের বয়স্ক মানুষটিও দিব্যি হাত লাগাচ্ছেন। বাড়ির মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। কেউ শুরুর দিকটা এগিয়ে দেয়। কেউ ফিনিশিংয়ে বেশি পারদর্শী। কারও হাতে রঙের কাজ দারুণ খেলে। কেউ কাগজ কেটে রাখে, কেউ আঠা তৈরি করে। সব ঘরেই কিছু না কিছু কাজ হচ্ছে। সব ধরনের মুখোশ যে সবাই বানাতে পারেন, এমন নয়। মূলত পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই হয় ছৌ পালা। রামায়ন, মহাভারত, মহিষাশূরমর্দিনী এগুলোই বেশি জন-প্রিয়। এইসব পালার বিভিন্ন চরিত্রের আলাদা আলাদা মুখোশ।

এই মুখোশগুলো কি শুধু ছৌ শিল্পীদের

জন্য? মোটেই না। আপনি-আমিও কিনতে পারি। ছৌ নাচ নাচতে নাই বা পারলেন। বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে তো আপত্তি নেই। শহুরে অনেক বাড়িতেই শোভাবর্ধন করে এই মুখোশ। যাঁরাই অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে আসেন, তাঁদের অনেকেই ঘুরে যান এই গ্রাম থেকে। শীতের এই সময়টায় পরিযায়ী পাখিদের মতোই বিদেশিদের আনা-গোনাও লেগেই থাকে। বিদেশিরা আসার আগে নেট ঘেঁটে এ তল্লাটের নানা হেরিটেজের কথা আগেই জেনে আসেন। আর সেই হেরিটেজের তালিকায় চড়িদা গ্রাম তো আছেই। তাঁরাও এই গ্রামে আসেন, ছবি তোলেন, ভিডিও তোলেন। কত তথ্যচিত্র যে তৈরি হয়েছে, তার হিসেব কে রাখে! দেশি-বিদেশি কোন ম্যাগাজিনে কোন ছবি ছাপা হচ্ছে, তার হদিশও পাওয়া মুশকিল। এভাবেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামে এসেই অনেকে মুখোশ নিয়ে যান। আবার শীতের সময় রাজ্যের নানা প্রান্তে মেলা বসে। সেখানেও ডাক পড়ে শিল্পীদের। সেইসব মেলায় বিক্রি হয় ভালই। কখনও এজেন্ট মারফত নানা জায়গায় যায়। অনলাইনে কেনার সুযোগ নেই ঠিকই, তবে ফোনে অর্ডার দেওয়াই যায়। ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন কি চড়িদার কথা জানে! জানলে হয়ত বিপণনের নতুন দরজা খুলে যেত। আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে পারত।

শিমুলতলা একবারই আসে জীবনে

জয়দীপ চক্রবর্তী

‘উৎসব শেষ। সামনে এখন হু হু শীত। দিন ফুরিয়ে যায় সহজে। তারপর মন খারাপ করা সন্ধে-রাত। সেই রাত যত গভীর হয়, তত যেন এক শূন্যতা বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে মিশে যেতে থাকে সেই মহাশূন্যে।

এমন শীত-শীত রাতে কত কথা মনে পড়ে। সেই ছেলেবেলা, সেই কলেজ-বেলা, সেই সব বন্ধুবান্ধব...

মনে পড়ে এমনই এক শীতে গিয়েছিলাম শিমুলতলা। তখন যাদবপুরে পড়ছি। শিমুলতলার রুখু প্রান্তর, জোনাকি ভরা অন্ধকার মাঠ মনে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছিল।

ভেবেছিলাম, আবার একদিন আসব। একা একা ঘুরব চারপাশে।

কিন্তু আর যাওয়া হয়নি। প্রতিবার শীত এলেই শিমুলতলার সেই প্রান্তর, সেই অন্ধকার দেখতে পাই। ভাবি, যাব। একদিন নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই যেন যাওয়া হয় না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়!
এখন বুঝি, শিমুলতলায় কখনও যাওয়া যায় না। শিমুলতলা একবারই আসে জীবনে। সেই স্মৃতি এবং ফেরার স্বপ্ন নিয়েই জীবন কেটে যায়।'

ওপরের লেখাটা কপি পেস্ট করা। হাল আমলের নাম করা ঔপন্যসিক ও ছোট গল্পকার এবং 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সম্পাদক সিজার বাগচীর ফেসবুক পেজের একটি লেখা। মনকে দূরে কোথাও দূরে দূরে নিয়ে যেতে পারা লেখার জন্য সিজার বাগচীর প্রসিদ্ধি।

এখন প্রশ্ন, হঠাৎ এই লেখাটা নিলাম কেন? লেখাটা পড়ে দেখুন ভাল করে। যে জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য রোমান্টিক আকুতি সেই জায়-গাটার নাম শিমুলতলা।হ্যাঁ, 'দাদার কীর্তি' র সেই শিমুলতলা। কেদার সরস্বতীর সেই অপাপবিদ্ধ প্রেমের অঙ্কুরোদগমের সেই শিমুলতলা।

পপকর্ন-কোল্ডড্রিংকসের সাময়িক উন্মাদনার বাইরে গিয়ে বাঙালির গভীর প্রেমের স্মারক হয়ে রয়েছে যে শিমুলতলা। বাঙালি প্রেমের সেই সব পেয়েছির দেশ। আজও গভীরতা বিশিষ্ট যে কোনও মেয়েই চায় কেদারের মতো সরল প্রেমিক, যে কোনও ছেলেই চায় বাস্তবের সব রুক্ষতার থেকে নিজেকে জুড়োতে সরস্বতীর মতো শুধু ভালোবাসার জন্য ভালোবাসতে পারা ব্যক্তিত্বময়ী কোনও প্রেমিকাকে।

গোলপাহাড়ের টিলায় বসে...

শ্যামল মুখার্জি

পাহাড় বলবেন নাকি ছোট ছোট টিলা! দলমা রেঞ্জের দিকে গেলে এমন কত অসংখ্য টিলা দেখা যায়। কোনওটা রুক্ষ, কোনওটা আগাছায় ঢাকা। ট্রেনে যেতে যেতে বা বাসে যেতে যেতে দূর থেকেই সেইসব টিলা দেখেছি। কাছে যাওয়া হয়নি। কী জানি, যদি সাপখোপ থাকে! যদি বন্য জন্তু থাকে। তাছাড়া, ওই টিলায় কোন বাস দাঁড়াতে যাবে! কেনই বা দাঁড়াতে যাবে!

এই টিলা একেবারেই অন্যরকম। পাহাড়ের ঢালে চা-বাগান নতুন কিছু নয়। পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে উঠতে এমন কত বাগান উঁকি দেবে। কিন্তু এই গোলপাহাড়ের সৌন্দর্য অন্যরকম। একের পর এক ছোট্ট গোল গোল পাহাড়। সবগুলিই প্রায় একই উচ্চতার। সব ছোট পাহাড়গুলোই চা-গাছে ঘেরা। ধূসর বা রুক্ষ বাগান নয়, চরাচরজুড়ে সবুজের অভিযান। দু'পাশে দুটো গোল পাহাড়, মাঝের রাস্তা দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, দৃশ্যটা ভাবলেই অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ এসে যায়।

এই পথে বেশ কয়েকবার পেরিয়ে গেছি।

মিরিক থেকে দার্জিলিং ওঠার রুট। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার একটা রাস্তা উঠে গেছে কার্শিয়াং হয়ে। অঞ্জন দত্তর গানের ভাষায়, টুং, সোনাদা, ঘুম পেরিয়ে। সবাই এই রাস্তা দিয়েই ওঠেন। কারণ, সময় কিছুটা কম লাগে। কিন্তু হাতে যদি একটু বাড়তি সময় থাকে, তাহলে একবার মিরিক হয়ে উঠতে পারেন। যাওয়ার পথেই নেপাল সীমান্ত, টুক করে একবার ঝটিকা সফরে বিদেশ ভ্রমণ করে নিতে পারেন। নিদেন পক্ষে ওপারে গিয়ে এক কাপ চাও খেয়ে আসতে পারেন। আবার ভারতের ভূখণ্ডে ফিরে এসে সুখিয়া পোখরি, লেপচা জগৎ, ঘুম হয়ে দার্জিলিং পৌঁছে যেতে পারেন।

দূরত্ব একটু বেশি ঠিকই, তবে চা-বাগান আর পাইন বনে ঘেরা রাস্তা একটা বাড়তি রোমাঞ্চ এনে দেবে। আমাদের এই গোলপাহাড় অবশ্য এতটা দূরে নয়। তার অনেক আগেই। ধরে নিন মিরিক থেকে আরও আধ ঘণ্টার মতো। এখানে

পাহাড়টা একেবারেই অন্য রকম। ছোট ছোট টিলা। সাহেবরা চা-বাগান বানাতে গিয়ে দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটাও মাথায় রেখেছিলেন। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, আর কোথাও যাওয়ার দরকার পড়বে না।

এর সন্ধান দিয়েছিলেন তাবাকোশির বিজয় সুব্বা। তাঁর হোম স্টেতেই ছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে কোথায়? সেই সিদ্ধান্তের ভার তাঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনিই বলেছিলেন, নেপাল সীমান্তের কাছে একটা গ্রাম আছে, একেবারে চা-বাগানের মাঝেই। দেখুন, আপনাদের ভাল লাগবে। তিনিই সন্ধান দিয়েছিলেন মঞ্জোশীলা হোম স্টের। আসলে, তাবাকোশি এতটাই ভাল লেগেছিল যে সংশয় হচ্ছিল, পরের জায়গাটা যদি ভাল না হয়। কিন্তু গন্তব্য যত এগিয়ে আসছে, মুগ্ধতা যেন তত বাড়ছে। পাইন গাছের জঙ্গল থেকে মেঘ ভেসে আসছে। সঙ্গে দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান তো আছেই। যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানেই ভিউ পয়েন্ট।

দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম মঞ্জোশীলায়। একমুখ হাঁসি নিয়ে হাজির মনোজ তামাং। ভারী চমৎকার মানুষ। এমন সরল, আন্তরিক ও অতিথি পরায়ণ মানুষ চাইলেও ভুলতে পারবেন না। পুরো বাড়িটাই পাইন কাঠে মোড়া। সামনে ছোট্ট একফালি উঠোন। সেখানে

বসলেই হাতের সামনে ধরা দেবে সেই গোলপাহাড়। ঘরের বিছানায় বসে মনে হবে, জানালার ওপারেই যেন চা বাগান। এত কাছ থেকে এমন সুন্দর বাগান দেখার রোমাঞ্চই আলাদা। মনের মধ্যে জমে থাকা নাগরিক ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি একলহমায় যেন হারিয়ে যায়। মনে হবে, চুলোয় যাক কাজবাজ, চুলোয় যাক ব্যস্ততা। সব ছেড়ে এখানেই থেকে যাই। সঙ্গে যদি এমন আতি-থেয়তা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। একটা ছোট্ট সতর্কীকরণ: দিনের বেলা বেশ রোমাঞ্চকর। তবে সূর্য ডুবলে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। তাই পর্যাপ্ত শীতপোশাক নিয়ে যাওয়াই ভাল।

আলাদা করে কোনও গাড়ি নেওয়ার দরকার নেই। আলতো পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যান গোলপাহাড় ভিউ পয়েন্টের দিকে। হাঁটা পথে মিনিট দশ। দু-পাশে খাড়া চা-বাগান। আপনি আপন মনে হেঁটে যান। যতদূর মন চায়। কখনও ইচ্ছে হলে কোনও এক টিলায় উঠে পড়ুন। ছবি তোলার শখ থাকলে এটুকু হলফ করে বলা যায়, আপনার সেরা মুহূর্তগুলো হয়ত এই গোলপাহাড়ের জন্যই তোলা আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য ঘটা করে টাইগার হিল যেতে হবে না। হোম স্টের সামনের ওই ছোট্ট পাহাড়ে উঠে পড়ুন। পাহাড় শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উঠতে লাগবে বড়জোর মিনিট দশেক। বয়স্করাও অনায়াসে উঠে পড়তে পারেন। একটু শুধু সাত সকালে উঠে পড়ুন। সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি কীভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর ঠিকরে পড়ছে, কীভাবে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা ছন্দে ছন্দে রঙ বদলাচ্ছে, দেখতে থাকুন। কখনও হয়ে উঠছে বাদামি, কখনও সোনালি, আবার কখনও ঝকঝকে সাদা।

ছবি কত কথা বলে যায়! গুগলবাবু তো আছে। একবার গোলপাহাড় লিখে দেখুন। তাহলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চাইলে ইউটিউবের শরণ নিতেই পারেন। একবার শুধু একঝলক দেখে নিন। যেমন দেখছেন, তার থেকে ঢের ভাল। তথাকথিত দার্জিলিং, গ্যাংটক তো অনেক দেখেছেন। এবারের ঠিকানা হোক একটু নিরিবিলিতে। ওই গোলপাহাড়ে অলসভাবে দুটো দিন কাটিয়ে আসুন।

বেঙ্গল টাইমস

১৫ আগস্ট, ২০২২

ISSN 2445-5657

bengaltimes.in